সিঁড়ি

ধর্মনিষ্ঠ সংরক্ষণশীল পরিবারের ছেলে হয়েও আমার স্বামী পুরোপুরি নাস্তিক, একেবারে কাঠ-নাস্তিক যাকে বলে।

আমার শাশুড়ি মাঝে মাঝে আক্ষেপ করে বলতেন, "বউমা, আমার ছেলেটাকে একটুও পাল্টাতে পারলে না? কত বউয়েরা তো দেখি স্বামীকে একেবারে ঢেলে সাজিয়ে নেয় নিজের পছন্দমত করে। তুমি কোন কম্মের নও।"

আমার শাশুড়ি আমাকে দারুণ ভালবাসতেন, সবার কাছে প্রশংসা করে বেড়াতেন। আমি তাঁর এই অনুযোগ একেবারেই গায়ে মাখতাম না। হাসিমুখে মাথা নীচু করে শুনে যেতাম।

স্বামীর বন্ধুরা বলতেন, "জোয়ান বয়সে অনেকেই নাস্তিক থাকে। তারপর যেমন যেমন বুড়ো হতে থাকে, শরীর-স্বাস্থ্য-মনোবল ভেঙে পড়ে, তখন সবাই ঈশ্বরের শরণ নেয়। এ একেবারে অবধারিত।"

অনেকে আবার অন্যভাবে বোঝাতেন।

বলতেন, "বুড়ো বয়সে পুজোআচ্চা - সাধনভজন করে অঢেল ফাঁকা সময়টা ভরিয়ে রাখা যায়, লোকজনের সঙ্গ পাওয়া যায়। নাস্তিক মানুষের কর্মহীন, সঙ্গীহীন দিনগুলো শুধু বিষন্নতা আর একঘেয়েমিতে ভরা।"

সত্তরের কোঠায় এসেও আমার স্বামী আগের মতই নাস্তিক রয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে এক চুলও পরিবর্তন ঘটেনি। তবে শরীর-স্বাস্থ্যের বয়সোচিত অবনতি বেশ কিছুটা হয়েছে। আমাদের দুজনেরই। আর এই স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই ইদানীং আমাদের এত বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয় যে পুজো-আচ্চা সাধন-ভজনের অভ্যাস থাকলেও এখন আর সময়ে কুলিয়ে ওঠা যেতো না।

MDM (মুরলীধর মগনলাল) হাসপাতালের অর্থোপিডিস্ট ডঃ মান্নার নাম-ডাক আছে। মোট বারো জন রুগী দেখেন এক দিনে। তাড়াতাড়ি না গেলে লিস্টে জায়গা পাওয়া যায় না, সাতসকালে রুগীরা এসে লিস্টে নাম দিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে ডঃ মান্না চেম্বারে আসার অনেক আগে থেকে। আমার হাঁটুর জন্যে প্রতি সপ্তাহে যেতে হয়, প্রত্যেক বারই দু'তিন ঘণ্টা লেগে যায়। আমার স্বামী বই নিয়ে যান। বসে বসে বই পড়েন। আর আমি আশেপাশের মানুষজন দেখি। নানারকম চিত্তাকর্ষক, চিন্তাউদ্দীপক চরিত্র ও ঘটনা চোখে পড়ে।

ওয়েটিং রুমটা একটা প্রকাণ্ড বড় হলঘর। তার তিনদিকে ছোট ছোট চেম্বারে ডাক্তাররা বসে। দরজার উপরে একটা ফলকে অপেক্ষমান রুগীদের নম্বর ফুটে ওঠে। সেই নম্বর অনুযায়ী রুগী চেম্বারে ঢোকে।

তিনটে করে চেম্বার একদিকে, তিনদিক মিলিয়ে ন'টা চেম্বারে ন'জন ডাক্তার। অর্থোপিডিস্ট ডঃ মান্নার পাশের ঘরটা গায়নাকলজিস্ট ডঃ তলোয়ারের চেম্বার। তার রুগীরা কাছাকাছি চেয়ারে বসেছে। আমার অল্প দূরে চেয়ারে বসা একজন মহিলা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দারুণ রূপসী আর তেমনি সাজগোজ। বয়স বোধহয় পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে এমন নিখুঁতভাবে সাজগোজ করতে পারে কেউ, এই বয়সের কাউকে এত সুন্দর লাগে, না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। এক কথায় চেহারা ও চালচলনে হুবহু রাজেন্দ্রানীর মত।

ভদ্রমহিলার সামনে দাঁড়িয়ে একটি যুবক। তাদের কথাবার্তা শুনতে না পেলেও ধরন ধারণে আন্দাজ করলাম যুবকটি ভদ্রমহিলার ছেলে। মাথা হেঁট করে মার কথা শুনছে, মাঝে মাঝে এক আধটা কথা বলছে। মুখে কুণ্ঠিত কৃতার্থ হাসি। ভদ্রমহিলা মনে হয় কোন ব্যাপারে রুষ্ট হয়েছেন। ভুরু জোড়া বারে বারে কুঞ্চিত হচ্ছে। নীচু গলায় হাত নেড়ে নেড়ে কি বোঝাচ্ছেন ছেলেকে। বলার ধরন দেখে মনে হয় দরকারী কিছু। ছেলেটি ঘাড় হেলিয়ে সায় দিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা এক নাগাড়ে কিছুক্ষণ কথা বলে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন। ছেলেটি চলে গেল। খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়ালো।

একটি অল্পবয়সী বউ - বোধহয় সবে মাসকয়েক হল বিয়ে হয়েছে - সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর পরা, পরনে ভারী সিল্কের এমব্রয়ডারী করা সালোয়ার কামিজ, দু'হাতে কনুই অবধি চুড়ি, ঠোঁটে গালে অনেকখানি রুজ-লিপস্টিক ঘষেছে - ছেলেটিকে দেখে ধড়মড় করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ছেলেটি হাত নেড়ে ওকে বসতে বললো। মেয়েটি জুবুথুবু ভাবে বসে পড়লো। আন্দাজ করলাম রাজেন্দ্রানী মার্কা মহিলা মেয়েটির শাশুড়ি, যুবকটি স্বামী। মেয়েটি হয়তো কোন বড়লোকের আদরের দুলালী। বাপ-মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়েছে। খুব একটা চটপটে ফটফটে কেতাদুরুস্ত নয়, দুনিয়ার হাল-চাল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এখনও।

রাজেন্দ্রানী ওদিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। মুহূর্তেকের জন্যে তার চোখে মুখে এমন একটা অবিমিশ্র কঠোর অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো যে আমি চমকে উঠলাম। ছেলেটির দিকে নজর রাখলাম। নতুন বউয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছে। মেয়েটি স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ল□ায় মাথা নীচু করছে। আজকালকার দিনে এই বয়সী মেয়েদের এত ল□াবনত দেখলে বিরক্তই লাগে। ছেলেটি একবার খেলাচ্ছলে নিজের পা দিয়ে মেয়েটির জরীর নাগরা পরা পায়ে চাপ দিলো। মেয়েটি একেবারে বিসম্বৃত হয়ে পড়লো। মেয়েটা যে তার এই সংক্ষিপ্ত বিবাহিত জীবনেই স্বামীকে দারুণভাবে ভালবেসে ফেলেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বামী?

ছেলেটি ততক্ষণে তার মায়ের কাছে ফিরে এসেছে। মা নীচু গলায় ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলো। এরপর গায়নাকলজিস্টের দরজায় ওদের নম্বর ফুটে উঠতেই ওরা তিনজন চেম্বারে ঢুকলো - মা, ছেলে ও সবার পিছনে স্কলিত পায়ে ঘাড় হেঁট করে নতুন বউ।

একটু পরেই আমাদেরও ডাক পড়লো। ডঃ মান্না টেস্ট রিপোর্টগুলো দেখে প্রেসক্রিপ্শন লিখে দিলেন। সব মিলিয়ে মিনিট দশেকও লাগেনি বোধহয়। নীচে নামার জন্যে লিফ্টের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। একদিকে লিফ্ট আর তার একটু দূরেই সিঁড়ি। লিফ্টের অন্যদিকে কফি-বুথে চা, কফি ও নানাবিধ হালকা জলখাবার বিক্রি হচ্ছে।

সাতসকালে তাড়াহুড়ো করে খাওয়া চা আর দু'খানা বিস্কুট কখন হজম হয়ে জল হয়ে গেছে।

বল্লাম, "কিছু খেয়ে নিলে হত না?"

স্বামী বললো, "নিশ্চয়ই !"

বুথের সামনে বেশ কয়েকজন খদ্দের জমা হয়েছে। আমাদেরই মত রুগীরা সব। হাসপাতালে আগেভাগে হাজিরা দেবার তাগিদে জলখাবার খাওয়ার সময় পায়নি। এখন কাজ মিটে যাবার পর সামান্য কিছু খেয়ে নিচ্ছে চট্পট্।

৩

কাগজের প্লেটে একজোড়া করে প্যাটিস্ ও প্লাস্টিকের কাপে গরম কফি একপাশে দাঁড়িয়ে খেতে লাগলাম দু'জনে। এমন সময় আমাদের পাশ দিয়ে রূপসী মহিলা, তার ছেলে ও ছেলের বউ বেরিয়ে গেল। লিফ্টের কাছে গিয়ে নতুন বউ দাঁড়িয়ে পড়লো।

ছেলেটা বউয়ের হাত ধরে টানলো, "না, লিফ্ট নয়, সিঁড়ি দিয়ে নামবো আমরা।"

"সে কি? কেন?"

শাশুড়ি বললেন, "তোমার একটু এক্সারসাইজ দরকার।"

কফি ও প্যাটিস খেয়ে একবার বাথরুমটা ঘুরে এলাম। বাড়ি যাবার পথে কিছু কেনাকাটা আছে, সে-সব সেরে বাড়ি ফিরতে অন্ততপক্ষে আরও ঘণ্টাখানেক লাগবে। লিফ্টে করে নেমে আবার সেই মহিলা ও তার ছেলের দেখা পেলাম। ভদ্রমহিলার চোখে আঁচল, ছেলে কাঁদো কাঁদো মুখ করে মায়ের কাঁধে হাত রেখে মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। ওদের ঘিরে কিছু লোক জটলা করছিল। তারাই বললো ওদের নতুন বউ সিঁড়ি থেকে পড়ে সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছে। পোয়াতি ছিল। পেটের বাচ্চাটা তো গেছেই, মাও বাঁচে কিনা সন্দেহ। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে যমে মানুষে লড়াই চলছে এখন।

"এই অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামছিল কেন লিফ্টে না এসে?"

"লিফ্ট্ সম্বন্ধে নাকি দারুণ ভয় ছিল মেয়েটার। ক্লোস্ট্রোফোবিয়া। পোয়াতি হবার পর আরও বেড়ে গিয়েছিল ভয়টা।"